বাবার চিঠি

শুজা রশীদ

যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা হলেও ঝট করে যাওয়া হলো না। মা গর্ভবতী, আমাকে এবং রুশীকে নিয়ে একাকি তার পক্ষে এতোখানি পথ যাওয়াটা সহজ হবে না। যদিও মা আমার ব্যাপারেই বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করলো তবুও আমার ধারণা রুশীকে নিয়েই তার দুঃশ্চিন্তা বেশী। সে মাঝে মাঝে এমন সুর করে কান্না ধরে যে থামানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। ঐসব কান্না-কাটি জাতীয় বস্তু আমার মধ্যে আসে না।

আমার কৌতুহল কিঞ্চিৎ বেশী। সুযোগ পেলেই চারদিকে চক্কর মারতে পছন্দ করি। মায়ের সেটা বিশেষ পছন্দ নয়। চারদিকে খারাপ মানুষের ছড়াছড়ি। যাইহোক, দাদু বুঝলেন যে তাকেই শেষ পর্যন্ত খুলনা যেতে হবে আমাদেরকে নিয়ে। গ্রামে জমি-জিরেত সংক্রান্ত কিছু কাজ কর্ম না সেরে তার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। তাতে যে আমি খুব একটা মনকষ্ট পাচ্ছিলাম তা নয়। মাঠে-ঘাটে ঘুরে, আলেকের বাঁশি শুনে আর গরু ছাগল মাঠে চরিয়ে, পুকুরে পাটকাটির মাথায় বড়শি ঝুলিয়ে মাছ ধরে আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে, আমার সময়টা ফুর ফুর করে কেটে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে মা-ও খুলনায় যাবার আগে নানু বাড়ি থেকে আরেকবার ঘুরে আসতে চাইলেন। কবে আবার এদিকে আসা হয়। শুনেই মনটা ভালো হয়ে গেলো। রানী আপার সাথে কটা দিন পাড়া ঠেঙিয়ে বেড়ানো যাবে। ঠিক হলো আলেকই গরুর গাড়িতে করে আমাদেরকে পৌঁছে দেবে, কিন্তু নানান কারণে সেটাও পিছিয়ে যেতে লাগলো। মায়ের শরীরটাও মনে হলো একটু খারাপের দিকে। মাঝে মাঝেই বমি হয়। ঝিমা তাকে বিছানায় শুয়ে থাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেন। বাচ্চা-কাচ্চা হবার ব্যাপারটা এতো ঝামেলা জানা ছিলো না।

একদিন গ্রামের রাস্তায় পোস্টম্যানের সাথে দেখা। আমি আলেকের সাইকেলে চেপে হাটে যাচ্ছি এক সের রসগোল্লা আনতে। পোস্টম্যান আমাদের থামালো।

-এই আলেক, থাম। ও রশীদের ছেলে না?

–হ। বড় ছেলে। খোকা, এ হলো আহমদ ভাই। আমাদের পোস্টম্যান। চিঠি-পত্তর কিছু আছে নাই?

–সে তো আছেই। ওগো বাড়ির দিকেই তো যাচ্ছিলাম। রশীদের চিঠি আইছে। খোকা, বাবার চিঠি নেবা?

আমি এক লাফে সাইকেল থেকে নীচে নামি। -নেবো, নেবো। পোস্টম্যান রংচঙা একটা চিঠি আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। উপরে রঙীন স্ট্যাম্পটা জ্বলজ্বল করছে। আমি সেটা হাতে পেয়েই বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড় দেই। আলেক সাইকেলে আমার পিছু নেয়।

–খোকা, সাইকেলে ওঠ। দৌড়ে কত দূর যাবি?

সঠিক কথা। আমি তার সাইকেলের হ্যান্ডেলে উঠি। আলেকের পংখীরাজ ছুটে যায়। পেছনে পোস্টম্যান আহমদ ভাইয়ের সতেজ হাসির শব্দ শুনি।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে আমি অনেক হৈ চৈ ফেলে দিলাম। সবার হাত ঘুরে সেটা অবশেষে দাদুর হাতে গিয়ে থামলো। চিঠিখানা দাদুর কাছেই লেখা। তিনি খাম ছিঁড়ে ভেতরের দুই পাতার লম্বা পত্রখানা বের করলেন। তার ঘরের মেঝেয় আমরা সবাই গোল হয়ে বসি। দাদু জোরে জোরে পত্রখানা পড়তে থাকেন।

বাবার পোস্টিং হয়েছে কোয়েটায়। ট্রেনিং ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তার সময় নেই। পরিস্থিতি হঠাৎ করেই খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। তার পূর্ব প্রস্তুতি চলছে। বাবা সেখানে বাসা পাননি। আপাতত উঠেছেন একজন সহকর্মীর বাসায়। ছোট দু'কামরার বাসা। সেখানে আমাদেরকে তোলা সম্ভব হবে না। তাছাড়া কোয়েটায় কতদিন থাকা যাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। তাকে অন্য এক জায়গায় পোস্টিং করার কথা ইতিমধ্যেই উঠেছে। সেই স্থান নাকি আরো দূরে। আমাদের জন্য তার মন খারাপ হয়। আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাসা না পেলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সব মিলিয়ে বেশ ঝামেলা চলছে। কর্মস্থলে যদিও রাজনীতির প্রভাব তেমন নেই তারপরও তার যে একেবারেই কোন রেশ নেই তা নয়। সৈনিকদের মধ্যে মতবাদের ফারাক আছে। বিভিন্ন সূত্রের জের ধরে তা প্রকাশ পায়। অন্যান্য আরো কয়েকজন বাঙালি ডাক্তারের মতো বাবাও চুপচাপ থাকেন। অকারণে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই। পরিস্থিতি যদি বাস্তবিকই সংঘর্ষের দিকে মোড় নেয় তখনই সিদ্ধান্ত নেবার পালা আসবে। তিনি কোন অবস্থাতেই পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনীর হয়ে কাজ করবেন না। তারাও যে তাকে ঝট করে নিস্তার দেবে সে সম্ভাবনাও নেই এমনি আরো অনেক কথা লিখেছেন বাবা। এক পর্যায়ে গিয়ে দাদু সশব্দে পড়া বন্ধ করে পত্রখানা মায়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

–তোমার কাছে খানিকটা লিখেছে বৌমা।

মা হাপুস হুপুস করে কাঁদছিলেন। চিঠিখানা নিয়ে ঘরে ঢুকে ছিটকিনি আটকালেন। বুঝলাম বাবাকে ছাড়া তার সময়টা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। রুশী মায়ের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চোখের জল নাকের জল এক করছে। আমি তাকে নিয়ে আলেকের সঙ্গী হয়ে গোয়াল ঘরে চলে এলাম। ঝিমার দুটি গাভী আছে। তাদের একটা মায়ের মতই গর্ভবতী। তার বেঢপ পেটে রুশীকে হাত বোলাতে দেয়ায় তার কান্না মুহূর্তে থেমে গেলো। গাভীটা খুব মায়া মায়া চোখ করে রুশীকে দেখতে লাগলো। রুশী অনেক চিন্তাভাবনা করে বললো-ওর কি আমার মতো একটা মেয়ে হবে? এই কথায় আমি এবং আলেক গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলাম। রুশী বিরক্ত হয়ে বললো-হ্যা হবে, দেখো। আমি বললাম। তোমার মতো পাজী ছেলে ওর হবে না। মায়েরও হবে না।

মন্দ কথা। আমি গম্ভীর মুখে বললাম-কুলুক্ষণে কথা বলবি না।

সেদিন রাতে খাবার আগে আর মায়ের দেখা মিললো না। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি বেরুলেন তার চোখ মুখ ফুলে ঢোল হয়েছে। বোঝা গেল অনেক কান্না কাটি করেছেন তিনি। ঝিমা বিস্তর গালমন্দ করলেন মাকে অকারণে এতো ভেঙে পড়ার জন্য। সেই রাতেই ঠিক হলো আমরা দু'এক দিনের মধ্যেই নানু বাড়ি যাবো। সেখান থেকে ফিরে এসেই খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। বাবা তার চিঠিতে মাকে বিশেষ করে লিখেছেন খুলনায় খালার বাসায় থাকার জন্য। সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি আমাদের থাকাটা তার কাছে নিরাপদ মনে হচ্ছিলো না।

Avevi bvbi evwo I wRb-cix

এবার নানু বাড়ি গিয়ে দুটা অভিনব ব্যাপার দেখার সৌভাগ্য হলো। একটা হচ্ছে জিনে ধরা, অন্যটা লাঠি চালানো।

রানী আপার মুখে জিনের অনেক কেচ্ছা-কাহিনী শুনেছি। গ্রামাঞ্চলে জিন-পরী খুবই পরিচিত অস্তিত্ব। প্রায় প্রতিটি গ্রামবাসীরই নানান ধরনের অভিজ্ঞতা আছে যা কোন না কোনভাবে জিন অথবা পরী সংক্রান্ত। রানী আপার কাছ থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি, জিন হচ্ছে আগুনের তৈরি। তাদেরকে দিনের আলোতে দেখা যায় না। সাধারণত অন্ধকারে তারা দেখা দেয়, যদিও সবাই আবার তাদেরকে দেখতে পায় না। পরী হচ্ছে জিনদের স্ত্রী লিঙ্গ। জিন-পরীদের মধ্যে ভালো খারাপ দু'ধরনের অস্তিত্বই আছে। তবে খারাপদের নিয়েই মানুষকে বেশী বিব্রত হতে হয়। তারা স্বাভাবিক মানুষদের তেমন ক্ষতি করতে না পারলেও মানসিকভাবে যারা দূর্বল তাদের ঘাড়ে চেপে বসে। তারা ইচ্ছা করলে যাদের ভেতরে ভর করে, তাদেরকে দিয়ে নাকি অনেক ভয়ানক কান্ড কারখানা ঘটাতে পারে। গ্রামে নাকি সে ধরনের ব্যাপার হর-হামেশা ঘটছে। রানী আপা আমাকে বেশ কিছু গল্প শুনিয়েছিলো। একবার নাকি এক জিন অন্য এক মানুষের বেশ ধরে আমাদের এক দুঃসম্পর্কের ভাইকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নদীর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো। ভাইটি সাঁতার জানায় সেই যাত্রা বেঁচে যায়। অন্য একবার এক পরী জনৈক গ্রামবাসী যুবককে তালগাছের মাথায় তুলে তিনদিন আটকিয়ে রেখেছিলো। পরে ওঝা ডেকে নানান তুক-তাক করার পর রক্ষে। পরী বাপ-বাপ বলে পালালো। যুবকটি মাটিতে নেমে এসে অবাক কণ্ঠে বললো-কি হইছে? তোমরা কি করো সব?

রানী আপাসহ আরো অনেকেরই ধারণা বাঁশ ঝাড়ের মধ্যেই এই জিন-পরীদের আবাস। গভীর রাতে বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটা চলা করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কোন মন্দ জিন কখন কার ঘাড়ে চেপে বসবে কে জানে?

যাই হোক, ছোট নানীর যে জিনের দোষ আছে সেটা সারা গ্রামের জানা। এমনিতে তিনি খুবই হাসি খুশী, ছটফটে মানুষ। কিন্তু যখন জিন তার উপরে ভর করে তখন নাকি তার এক ভিন্ন রূপ। নানুর বাড়িতে এসব নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে। ছোটরাও সেই সব গল্পের পুংখানুপুংখ জানে। প্রতিটি গল্পই গড়ে উঠেছে ছোট নানীর প্রতিটি জিনের আছর হবার ঘটনার পর। সবাই

মাস হিসাবে সেই ঘটনাগুলির উল্লেখ করে। যেমন বড় নানী হয়তো বললেন - চৈত মাসে যেবার ছোটরে জিনে ধরলো .....

অনেক গল্প শুনলেও এখন পর্যন্ত জিন পরী দেখা বা তাদের আসর হয়েছে এমন কাউকে দেখার সুযোগ হয়নি। এবার নানা বাড়ি এসে আমার কপাল খুলে গেলো। যেদিন বিকালে এসে পৌঁছুলাম সেদিন সন্ধ্যাতেই ছোট নানী কথা নেই বার্তা নেই, তার নিজ ঘরের দরজার ঠিক সামনেই ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেলেন। তার চোখ উল্টে গেলো, দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো। আমরা ছোটরা সামনের উঠোনেই খেলছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকালে একটি হৈ চৈ শুরু হলো। যে যেখানে ছিলো ছুটে এলো। সবাই বলতে লাগলো -ছোট নানীর উপর জিনের আছর হইছে। জিন, জিন।

বড়দের ভীড় ঠেলে যখন ছোট নানীর কাছাকাছি পৌঁছলাম আমি আর রানী আপা ততক্ষনে ছোট নানীকে কেউ দরজার সামনে থেকে সরিয়ে একটা শীতল পাটির উপর শুইয়ে দিয়েছে। ছোট নানী কেমন অদ্ভুৎ ভঙ্গীতে তার চারদিকে দৃষ্টি বোলাচ্ছেন, তাকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি আমাদের কাউকে চিনতে পারছেন। তার শরীর নির্জীবের মতো সটান হয়ে পড়ে আছে। সবাই মনে হলো এই সব আলামতের সাথে বহুল পরিচিত। অনেকই উদ্ভট সব প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

–তোর নাম কি?

–তোর বাড়ি কোথায়?

– আরবের সময় কত?

– তোরা ক'জন আছিস? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্যের ব্যাপার ছোট নানী অসম্ভব ভারী এবং কর্কশ কণ্ঠে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন। জিনের নাম ইছলন। সে একাই ভর করেছে ছোট নানীর উপর। তার বাড়ি কাছেই। ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় আধা ঘন্টা এই প্রশ্নোত্তর পর্ব চললো। আমরা ছোটরা চোখ গোল গোল করে পুরো ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছি। আমি শক্ত করে রানী আপার হাত ধরে আছি। রানী আপা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো-ভয় পাস না। জিনেরা ছোটদের কিছু করতে পারে না। আমরা হলাম ফেরেশতাদের দোস্ত। ফেরেশতারা যেখানে থাকে সেখানে ওরা যেতে পারে না।

আমি সশব্দে ঢোক গিলি। শুনেছি দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা থাকে। তারা নিজেদের জায়গা মতো থাকলেই হয়।

শেষ পর্যন্ত এক ওঝা হন্দদন্ত হয়ে ভীড় ঠেলে ছোট নানীর সামনে এসে বসলো। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো-ভালোয় ভালোয় যাবি নাকি পিটান দিয়ে তাড়াতে হবে?

জিন চিন্তিত কণ্ঠে বললো-আর একটু থাকি?

ওঝা বলে উঠলো–আর এক মিনিটও না। ভাগ জলদি। দাঁড়া তোরে এমন মাইর দেবো যে পালায়ে বাঁচবি তুই।

সে তার ঝোলা থেকে চিকন একটি কঞ্চি বের করলো। আমি অবাক হয়ে বললাম-রানী আপা, ও কি ছোট নানীকে মারবে? রানী আপা ফিসফিসিয়ে উঠলো- ছোট নানীকে না, জিনকে মারবে। জিন যতক্ষণ ছোট নানীর শরীরে থাকবে ততক্ষন সব মার জিনের শরীরে লাগবে।

ব্যাপারটা জটিল মনে হলো। উপস্থিত সবাই দেখলাম খুব উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। সৌভাগ্য বশতঃ মারধোর পর্ব শুরু হবার আগেই জিন পালালো। ছোট নানী হঠাৎ শরীর ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। - কি হইছে? তোমরা সব এখানে কি করো?

ওঝা হাসলো-বদমাশ জ্বীনটা আবার আইছিলো ভাবীসাব। আমারে দেখেই এমন ভয় পাইছে যে পালায়ে বাঁচে না। হা হা হা।

ছোট নানী দ্রুত কাপড়-চোপড় সামলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ভীড়টা ঝট্ করেই পাতলা হয়ে এলো। জিন যে এতো সহজে হাল ছেড়ে দেবে এটা কেউই আশা করে নি। তাদেরকে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট মনে হলো। রানী আপা আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে পেছনের বাগানে নিয়ে এলো। -বাঁচা গেছে, তাড়াতাড়ি মিটছে। এই ওঝার কান্ডকারখানা আমার পছন্দ নয়। বছরখানেক আগে এক চাষার মেয়েকে জিনে ধরছিলো। এই ওঝা কি সব ছাই ভস্ম করলো, মেয়েটা মরেই গেলো। এই ওঝা ভালো না। আমি মাকে বলেছি, আমাকে যদি কখনো জিনে ধরে তাহলে একে যেন না ডাকে।

আমার সমস্ত শরীর শির শির করে উঠলো। -তোমাকে জিনে ধরবে?

আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখেই রানী আপা হেসে উঠলো। -না রে। সাবধানের মার নেই, বুঝলি না। চল জব্বল চাচার দোকানে যাই।

খুবই চমৎকার প্রস্তাব। আমি সোৎসাহে সম্মতি জানাই। কিন্তু রানী আপা হঠাৎ চুপসে যায়। -থাক, আমাদের যাবার দরকার নেই। ঐ হারামজাদাটা ওখানে গ্যাট মেরে বসে থাকে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা দেয়। চল, আমাদের রাখাল ছ্যামড়াটাকে পাঠাই। রানী আপার সমস্যা আমি বুঝতে পারি। কোন আপত্তি করি না। রাখাল ছেলেটাকে দু'টাকার তেঁতুল বিস্কুট আনতে পাঠিয়ে আমরা পুকুর পাড়ে বসে পানিতে ঢিল ছুড়তে থাকি। সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে পুকুরের পানিতে দলবদ্ধ ঢেউয়ের আনাগোনা দেখতে খুব ভালো লাগে।

রানী আপা উদাস গলায় বললো - তোরা খুলনায় চলে যাবি?

–হ্যাঁ। বাবা বলেছে দেশের বাড়িতে থাকাটা নিরাপদ হবে না।

–ঠিকই বলেছে। মানুষজন আর আগের মতো নেই। যুদ্ধ লাগলে আমরাও হয়তো শহরে চলে যাবো। বাবা-মা আলাপ করছে।

–যুদ্ধ লাগবে নাকি? কাদের সাথে? ভারতের সাথে?

–নাহ। পাকিস্তানে-পাকিস্তানে। আমরা হলাম পূর্ব পাকিস্তান আর ওরা হলো পশ্চিম পাকিস্তান। ওরা আমাদের ভালো চায় না। তাই আমাদের দেশের মানুষজন ক্ষেপে গেছে। যুদ্ধ না বাঁধলেই ভালো। যুদ্ধে অনেক মানুষ মরে, মেয়েরা নষ্ট হয়।

–মেয়েরা কেন নষ্ট হয়?

–তুই বুঝবি নে। দেশে কত খারাপ মানুষ আছে। যুদ্ধের সুযোগ যেমন শত্রুরা নেয়, তেমনি এই বদমাশগুলোও নেয়। যুদ্ধ লাগলে আমিও খুলনায় চলে আসবো। মামা তোদের কবে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবে?

–জানি না। বাবা চিঠিতে লিখেছেন, তিনি চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাসা পাওয়া যাচ্ছে না।

–ভাবিসনে। মামা বাসা পেয়ে যাবে। দেখিস, শীঘ্রই পেয়ে যাবে। তোর নিশ্চয় বাবার জন্য মন খারাপ লাগে?

–হ্যাঁ। মাঝে মাঝে।

রাখাল ছেলেটা বিস্কুট নিয়ে ফিরে এসেছে। আমরা তিনজন পুকুর পাড়ে বসে গোগ্রাসে সেগুলো খেতে থাকি।

পরদিন সকালে উঠতে না উঠতেই রানী আপা আমার হাত ধরে টান দিলো।

-ভুলেই গেছিলাম রে। আজ নাসের মামার বাড়িতে লাঠি চালা হবে। চল, চল। দেরী করা যাবে না।

আমি অবাক হয়ে বলি - লাঠি চালা কি?

–গেলেই বুঝবি।

আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করি। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে, প্রতিবেশীদের ক্ষেতের বেড়া ডিঙিয়ে, বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া চিকণ পথ দিয়ে অবশেষে নাসের মামার পাঁচিল ঘেরা বিশাল উঠোনে এসে পৌঁছুলাম আমরা। রানী আপার কথাই ঠিক। উঠোন ভর্তি মানুষজন। এক মাঝবয়েসী লোককে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির হাতে বাঁশের চকচকে লাঠি। সে একটু পর পর লাঠি ঘুরিয়ে চিৎকার করছে - বক্কিলারে খা। বক্কিলারে খা

নাসের মামা তার রাজকীয় চেয়ারে খুব মেজাজি ভঙ্গীতে বসে আছেন। তার অনতিদূরে তিনজন যুবক চিন্তিত মুখে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়েসী লোকটি যেন তাদের দিকে ফিরেই বেশী বেশী করে লাঠি ঘুরাচ্ছে। একটু পরেই রানী আপা অন্যান্যদের মুখ থেকে টুকরো টুকরো ঘটনা শুনে আমার কাছে প্রকৃত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো। নাসের মামার সোনার ঘড়ি চুরি গেছে। মূল্যের চেয়ে বড় সম্মান। ঘড়িটা তার বাবার ছিলো। গত দু'দিন ধরে সেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ঘর থেকেই হঠাৎ করেই সেটা লাপাত্তা। তার সন্দেহ এই তিনজন যুবকের একজনই বস্তুটাকে সরিয়েছে। তারা নাসের মামার বাসায় জোন দেয় বা শ্রমিকের কাজ করে। অনেক অনুরোধ করেও তাদের কাছ থেকে ঘড়ি উদ্ধার করা যায় নি। অবশেষে কানাই পাগলার স্মরণাপন্ন হতে হলো। মাঝবয়েসী যে লোকটি বন বন করে লাঠি ঘোরাচ্ছে সেই কানাই পাগলা। তাকে পাগলা বলার কারণটা বোঝা গেলো না। তার চোখ মুখের ভাব-সাব দেখে আমার তাকে বিপদজনক মনে হলো।

কানাই পাগলা হঠাৎ লাঠি ঘোরানো থামিয়ে উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে দু'জন তাগড়া যুবককে সাহায্যকারী হিসাবে বেছে নিলো। তার নির্দেশে যুবক দু'জন তার হাতের লাঠিখানা সবলে চেপে ধরলো। কানাই পাগলা হঠাৎ যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে গেলো। সে যেন

একরকম দানবে পরিণত হলো। সাহায্যকারী যুবক দু'জনের বিপরীতদিকে এগিয়ে চললো তার লাঠি। যুবক দু'জন প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার গতি রোধ করতে পারছে না। লাঠি যেন হঠাৎ করে এক জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। পা-পা করে ঠেলতে ঠেলতে যুবক দু'টিকে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিক তিনজনের পাদপ্রান্তে নিয়ে এলো কানাই পাগলা। তার লাঠির মাথা সামনে পেছনে দুলছে। সে সমানে চীৎকার করে চলেছে-বক্কিলারে খা। বক্কিলারে খা। সোনার ঘড়ি বাইর কর নইলে তোর মায়ের মাথা খা।

এবং কি আশ্চর্য। হঠাৎ শ্রমিকদের একজন হুড়মুড় করে নাসের মামার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লো। হাউমাউ কান্নার জন্য তার কথাবার্তা পরিষ্কার বোঝা গেলো না। সমবেত জনতা করতালিতে ফেটে পড়লো। কানাই পাগলা আবার বন বন করে লাঠি ঘুরিয়ে তার কৃতিত্ব জাহির করলো। নাসের মামা ঠাস্ ঠাস্ করে শ্রমিকটার গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন। -ঘড়ি বাইর কর। কি করেছিস ঘড়ি?

–বেচে দিছি চাচা। পোলাটার চোখের ব্যারাম। ডাক্তার দেখানোর পয়সা নেই আমাকে মাফ কইরে দেন চাচা।

নাসের মামা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেন-মাফ-টাফ নেই। ওটা আমার বাপের দেয়া ঘড়ি। বল, কার কাছে বিক্রি করেছিস।

আবার থাপ্পড় খেয়ে শ্রমিকটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। রানী আপা আমার হাত ধরে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

আমি বললাম-ও চুরি করলো কেন?

রানী আপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। -ধান ভানার সময় হঠাৎ করে চোখে ধান ছুটে লেগে ওর চার বছরের ছেলেটার একটা চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। চিকিৎসা না করলে অন্য চোখটাও যাবে। আমি ওকে চিনি। ওর নাম আমান আলী। মানুষ ভালো। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। গ্রামে অনেক অভাব রে।

আচমকা আমরা একটা স্বাস্থ্যবান যুবকের মুখোমুখি পড়ে যাই। লোকটাকে আমি চিনতে পারি না। কিন্তু রানী আপার ব্যাজার মুখ দেখে আন্দাজ করি এই বশীর বদমাশ। সে এক গাল হাসি দিয়ে বললো–রানী, আমাকে দেখলে তুই এমন চোখ মুখ অন্ধকার করিস ক্যান? আমি তো মানুষটা খারাপ না। আমার কত সম্পত্তি তুই জানিস?

রানী আপা তিক্ত কণ্ঠে বললো-সম্পত্তি আপনার না, আপনার বাবার। কিন্তু যারই হোক, তা দিয়ে আমার কাজ কি? আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। আমাকে জ্বালাবেন না।

বশীর দাঁত বের করে নিলর্জের মতো হাসে। –বয়স কিছু না রে। মনটাই বড়। তোর রূপে আমি পাগল হইছি।

রানী আপা আমার হাত ধরে একটা ঝট্কা টান দিয়েই ভোঁ দৌড় দিলো। আমিও তার পিছু নিলাম। পেছনে বশীরের বিকট হাসির শব্দ শুনলাম। তার দুই একজন বন্ধুও সেই হাসিতে যোগ দিলো। রানী আপা একেবারে নানুবাড়ির পেছনের বাগানে এসে থামলো। আমরা দু'জনে কিছুক্ষণ হাঁপরের মতো হাঁপালাম। রানী আপা দম ফিরে পেতে বললো - গ্রামে কোন মেয়ের

লেখাপড়া করার উপায় নেই। বশীরের মতো বদমাশগুলো তাদের পেছনে লাগে। বাবা-মা ভয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। জীবনটা ওখানেই শেষ। আমি ঠিক খুলনা চলে যাবো।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠি। –চলে আসো রানী আপা। অনেক মজা হবে। তুমি আমার সাথে খালার বাসায় থাকবে।

রানী আপা চিন্তিত মুখে বললো- দেখি বাবা কি বলে। পুকুরে ঢিল ছুড়বি? চল যাই।

আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ পুকুরে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে নানান ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে থাকি।

শুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা, ১৯/০২/২০০৬

বিঃ দ্রঃ

জনাব শুজা রশীদ প্রবাসে বসে স্বদেশে নিজের হারানো দিনগুলোকে নিয়ে 'দামামা' নামে একটি বই লিখেছেন। আসছে মে - ২০০৬ তিনি তা বই আকারে ছাপতে যাচ্ছেন। তার আগে আমাদের কর্ণফুলী'তে তাঁর এ অপ্রকাশিত বইটি ধারাবাহিকভাবে আমাদের অগনিত পাঠকদের জন্যে তিনি পরিবেশন করছেন। প্রবাসী ব্যস্ততায় লেখা তাঁর এ প্রকাশিতব্য বইটি পড়ে কেমন লাগছে পাঠকরা আমাদের ইমেইল করে জানালে আমরা তাঁকে সাথে সাথে পাঠকদের মতামত জানিয়ে দেব।